পিস বাই পিস : ভারতীয় গার্মেন্টস শিল্পের অন্ধকার চেহারা

অর্চনা আগরওয়াল

*[লেখাটি 'হিমাল সাউথ এশিয়ান'-এর লেবার অ্যান্ড ইটস ডিসকনটেন্টস, মার্চ ২০১৫ সংখ্যার অর্চনা আগরওয়াল লিখিত Piece by Piece: The dark underbelly of India's garment industry-র অনুবাদ। সর্বজনকথার জন্য অনুবাদ করেছেন **কল্লোল মোস্তফা**]*

কতগুলো আবর্জনার স্তূপের পাশ দিয়ে রাস্তাটি চলে গেছে গার্মেন্টস শ্রমিকদের কলোনির দিকে। এই কলোনির শ্রমিকরা দিল্লির উপকণ্ঠে ন্যাশনাল ক্যাপিটাল রিজিয়নের (এনসিআর) গুরগাঁও শিল্পনগরীর 'উদ্যোগ বিহার' অঞ্চলের গার্মেন্টস কারখানাগুলোতে কাজ করে। এক রবিবার সকালে কলোনির সরু এক গলির মধ্যে হাতে চালানো পানির পাম্পের পাশে গোসল ও কাপড় কাচার সুযোগের জন্য অপেক্ষা করছিলেন বেশ কয়েকজন তরুণ। ২০টির মতো সিঙ্গল রুম আছে এ রকম বেশ বড়সড় একটা চত্বরে ঢোকার মুখে দাঁড়িয়ে আছেন উত্তর প্রদেশের গোরখপুর থেকে আসা ২৬ বছরের অভিবাসী শ্রমিক জ্ঞানেশ্বর। জ্ঞানেশ্বর সদ্য গার্মেন্টস শিল্পে প্রবেশ করেছেন। স্থানীয়ভাবে এই শিল্প 'এক্সপোর্ট লাইন' বা রপ্তানি লাইন হিসেবে পরিচিত, যেখান থেকে বিদেশি ব্র্যান্ডের জন্য পোশাক সরবরাহ করা হয়। গুরগাঁও এলাকার ২ হাজার গার্মেন্টস কারখানায় তাঁর মতো আরো ২ লাখ শ্রমিক কাজ করে। বেশির ভাগ রপ্তানিমুখী কারখানাই উদ্যোগ বিহারে অবস্থিত। তিনি সপ্তাহে ছয় দিন সকাল ৯টা থেকে বিকেল সাড়ে ৫টা পর্যন্ত কাজের জন্য মাসে পান ৫৮০০ রুপি (৯২ মার্কিন ডলার)। ক্রমবর্ধমান দ্রব্যমূল্যের মধ্যে এই অর্থ প্রয়োজনের তুলনায় একেবারেই অপর্যাপ্ত, তাঁকে প্রায়ই দৈনিক ১৫ ঘণ্টা কাজ করতে হয়, কোনো কোনো সময় সাপ্তাহিক ছুটির দিন রবিবারও।

উত্তর প্রদেশের ফায়জাবাদ থেকে আসা রশিদের বয়স ৫৫, তিনি ২০ বছরেরও বেশি সময় ধরে গার্মেন্টস শিল্পে কাজ করছেন। রশিদ স্থায়ী শ্রমিক হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করলেও তাঁর কর্মজীবনে বারবার ছেদ টানতে হয়েছে। যতবারই তিনি প্রভিডেন্ড ফান্ড ব্যবহার করতে চেয়েছেন, ততবারই তাঁকে চাকরি ছাড়তে হয়েছে, যার ফলে চাকরিরত অবস্থায় প্রভিডেন্ড ফান্ড থেকে তিনি প্রয়োজনের সময় ঋণও করতে পারেননি।

শ্রমিকদের মাসিক মজুরি প্রয়োজনের তুলনায় কম হওয়ার কারণে ওভারটাইম শ্রমিকদের জন্য জরুরি হয়ে পড়ে–তাদের তৈরি করা বিলাসী ব্র্যান্ডের পোশাকে ফুটে ওঠা জীবন থেকে তাদের পরিস্থিতি একেবারেই ভিন্ন। জীবনে এসব ব্র্যান্ডের হাজার হাজার পোশাক সেলাই করলেও এই শ্রমিকদের বেশির ভাগেরই নিজেদের তৈরি করা এইসব দামি পোশাক পরার সৌভাগ্য হবে না কোনো দিন। এই রকম একটি কারখানার শ্রমিক সের আনসারির পক্ষে তো এমনকি এসব ব্র্যান্ডের চেয়ে কম দামি পোশাক কেনাও সম্ভব হয়ে ওঠে না– "গত ২০ বছরে আমি আমার নিজের জন্য একটিও নতুন শার্ট কিনতে পারিনি। আমি সব সময়ই ৩০-৩৫ রুপি দিয়ে ফুটপাত থেকে সেকেন্ড হ্যান্ড বা ব্যবহৃত শার্টই কিনেছি।" আনসারির কথা শুনে অবাক হওয়ার কিছু নেই। গুরগাঁওয়ের পোশাক কারখানাগুলো গ্যাপ, মার্কস অ্যান্ড স্পেন্সার, অ্যাবারক্রোম্বি অ্যান্ড ফিচ, জারা, নেক্সট ইত্যাদি বিদেশি ব্র্যান্ড এবং বিবা, সত্য পাল ও ঋতু কুমারের মতো দেশি ব্র্যান্ডের জন্য পোশাক তৈরি করে, যে পোশাকগুলোর একেকটি কয়েক হাজার রুপি দরে বিক্রি হয়।

এইসব কোম্পানি থেকে সস্তা গার্মেন্টস পণ্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদার কারণে ভারতীয় গার্মেন্টস শিল্প এখন বেশ বড় একটি শিল্প, যেখানে বিপুলসংখ্যক শ্রমিক কাজ করে। কর্মসংস্থানের বিবেচনায় গার্মেন্টস শিল্পের অবস্থান বেশ ওপরের দিকে (কৃষি খাত এখনো ভারতের সর্বোচ্চ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে) এবং জিডিপি ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রেও এই খাতের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। ২০১৪ সালে ৬.৫ শতাংশ হারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রপ্তানির প্রবৃদ্ধি হয়; যদিও এর আগের পাঁচ বছরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গার্মেন্টস পণ্য রপ্তানির প্রবৃদ্ধি ছিল ২ শতাংশ। এর কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির পুনরুজ্জীবন এবং ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বী দেশ বাংলাদেশ থেকে রানা প্লাজা ধসসহ বিভিন্ন দুর্ঘটনার ফলে কর্মপরিবেশ নিয়ে উদ্বেগের কারণে রপ্তানি হ্রাস।

ফ্যাক্টরি অ্যান্ড ফ্যাব্রিকেটরস

গুরগাঁও, ফরিদাবাদ ও নয়দার কারখানাগুলো নিয়ে ন্যাশনাল ক্যাপিটাল রিজিয়নের প্রান্তস্থ এই অঞ্চলটি ভারতের অন্যতম পোশাক শিল্প কেন্দ্র। এই স্যাটেলাইট টাউনশিপগুলো দিল্লির আইনের আওতার বাইরে অবস্থিত এবং এখানে নজরদারিও রাজধানীর মতো নয়। বস্তুত, দিল্লির কঠোর শ্রম আইন ও হরিয়ানা রাজ্য সরকারের বিপুল করছাড়ের কারণে নব্বইয়ের দশকের দিকে দিল্লি থেকে বহু গার্মেন্টস কারখানা দিল্লির বিভিন্ন অংশ থেকে উদ্যোগ বিহার (হরিয়ানা রাজ্যের অংশ) অঞ্চলে সরে আসে। সাম্প্রতিক সময়ে এই কারখানাগুলোকে আরো দূরে হরিয়ানার মানেশ্বর বা রেওয়ারি অঞ্চলের দিকে সরিয়ে নেওয়ার প্রবণতা বেড়েছে।

এখানকার কারখানাগুলো ছোটবড় বিভিন্ন আকারের। ৪০০-৫০০ থেকে শুরু করে ১০০০ শ্রমিক কাজ করে এসব কারখানায়। ফ্যাক্টরি অ্যাক্টের আওতায় নিবন্ধিত এসব কারখানা বায়িং হাউস নামে পরিচিত মধ্যস্বত্বভোগী প্রতিষ্ঠান থেকে কিংবা বৈশ্বিক ব্র্যান্ডগুলোর কাছ থেকে সরাসরি অর্ডার পেয়ে থাকে। এই ধরনের নিবন্ধিত কারখানা ছাড়াও রয়েছে অসংখ্য অনিবন্ধিত ফ্যাব্রিকেটরস, যেখানে ১০ থেকে ৫০০ জন পর্যন্ত শ্রমিক কাজ করে। এই কারখানাগুলো ব্র্যান্ডগুলোর কাছ থেকে সরাসরি কাজ পায় না, নিবন্ধিত বড় কারখানাগুলোর মাধ্যমে তাদের কাজ জোটে। যেহেতু এই ফ্যাব্রিকেটর কারখানাগুলো নিবন্ধিত নয়, সুতরাং এসব কারখানা কোনো কর দেয় না এবং বিদ্যুৎ বিলের হারও বাণিজ্যিক হারের চেয়ে কম। সেই সাথে শ্রম আইনের বিধিনিষেধও এড়িয়ে যায়।

এই ফ্যাক্টরি ও ফ্যাব্রিকেটর ছাড়াও অনেক ক্ষেত্রে শ্রমিকরা

নিজেদের বাড়িতে থেকেই কাজ করে। বড় কারখানাগুলো অনেক সময় বোতাম লাগানোর মতো ছোট ছোট কাজ বাড়িতে থেকে শ্রমিকদের কাছে আউটসোর্স করে দেয়। এই শ্রমিকদের বেশির ভাগই নারী, যাদের মজুরি তুলনামূলকভাবে অনেক কম। ফলে বড় কারখানার উৎপাদন খরচ অনেক কমে আসে।

উৎপাদনের পরিমাণ যা-ই হোক, এই ধরনের উৎপাদন প্রক্রিয়া বৈশ্বিক অ্যাসেম্বলি লাইনের একেবারে শেষ ধাপে অবস্থিত। এই উৎপাদন প্রক্রিয়ার ইতিহাস বিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে। ১৯৫০-এর দশক থেকেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো উত্তরের ধনী দেশগুলোর জন্য পোশাক তৈরি করে আসছে: ১৯৫০ ও ৬০-এর দশকে জাপান, ৭০ ও ৮০-র দশকে হংকং, দক্ষিণ কোরিয়া ও তাইওয়ান, ৯০-এর দশকে চীন, ভারত, বাংলাদেশ এবং ইন্দোনেশিয়ার মতো দেশগুলো। আমদানি করা অংশ সেলাই করা থেকে শুরু করে এখন দেশগুলো নিজেরাই কাঁচামাল থেকে পণ্য উৎপাদনের পুরো কাজটি সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়ে গেছে, গার্মেন্টস শিল্পের ভাষায় যাকে বলা হয় 'ফুল প্যাকেজ সাপ্লাই'। এই প্রক্রিয়ার আওতায় কাপড় কেনা, ডিজাইন, ম্যানুফ্যাকচারিং, ফিনিশিং ইত্যাদি পুরো কাজই স্থানীয় কারখানাগুলো করে। এসব কাজে বৈশ্বিক ক্রেতাদের সমন্বয় করার প্রয়োজন যেমন পড়ে না, তেমনি এসব কাজে তাদের দায়দায়িত্বও তেমন থাকে না। বিদেশি ক্রেতারা শুধু পোশাক কেনে, যে পরিস্থিতিতে এইসব পোশাক উৎপাদিত হয় তার কোনো দায় তাদের থাকে না।

কঠিন দিন:

ব্র্যান্ড কোম্পানির পছন্দ অনুসারে একটি ডিজাইন থেকে নমুনা তৈরি করার মধ্য দিয়ে 'ফুল প্যাকেজ' উৎপাদন প্রক্রিয়া শুরু হয়। ডিজাইনটি বিদেশি ক্রেতার সরবরাহ করা হতে পারে বা স্থানীয় কারখানার নিজস্ব প্রক্রিয়ায় তৈরি হতে পারে। এই কাজটি সাধারণত একজন দক্ষ ও অভিজ্ঞ মাস্টার টেইলর বা ওস্তাদ দর্জির মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। আর নমুনা যিনি তৈরি করেন তাঁকে নমুনা নির্মাতা বা 'স্যাম্পলার' বলা হয়। এরপর এই ডিজাইন ব্র্যান্ড কোম্পানির কাছে পাঠানো হয় অনুমোদনের জন্য। ডিজাইন অনুমোদনের পর উৎপাদন বিভাগ প্রয়োজনীয় কাপড় ক্রয় করে (অনেক সময় ক্রেতাকে ব্র্যান্ডের নির্ধারিত সরবরাহকারীর কাছ থেকেই কাপড় কিনতে হয়) এবং রং করার জন্য পাঠানো হয়। দূষণবিষয়ক জটিলতা এড়ানোর জন্য রং করার কাজটি প্রায়ই দিল্লি থেকে বেশ দূরে পাঠানো হয়। এরপর অনুমোদিত ডিজাইনের নমুনা অনুযায়ী কাপড় কাটা হয় এবং সেলাই করার জন্য শ্রমিকদের কাছে পাঠানো হয়।

কারখানাগুলোতে একেকজন শ্রমিককে দিয়ে পুরো কাপড় সেলাই করার বদলে চেইন পদ্ধতিতে পোশাক তৈরি করা হয়। এই পদ্ধতিতে প্রত্যেক শ্রমিক সাধারণত একটি পোশাকের ক্ষুদ্র একটি অংশ সেলাই করে। এইভাবে সেলাই করার জন্য শ্রমিকদের অল্প প্রশিক্ষণ হলেই চলে, ফলে তাদের মজুরিও দেওয়া হয় তুলনামূলক কম। অথচ একটি পুরো কাপড় সেলাই করতে হলে একজন শ্রমিকের যথেষ্ট দক্ষতার প্রয়োজন হয় এবং এ ধরনের একজন দক্ষ দর্জির মজুরিও বেশি হয়।

উদ্যোগ বিহার অঞ্চলের কারখানাগুলোতে চেইন পদ্ধতি চালু হয় ১৯৯০-এর দশকে, যে কারখানাগুলোতে সেলাই মেশিনসহ সারি সারি শ্রমিকের অ্যাসেম্বলি লাইনের মাধ্যমে পোশাক সেলাই হয়। কাপড় এক মেশিন থেকে আরেক মেশিনের দিকে এগোতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত পোশাকের মূল কাঠামোটা সেলাই না হয়। চার্লি চ্যাপলিনের মডার্ন টাইমস চলচ্চিত্রের মতো প্রত্যেক শ্রমিক পোশাকের ছোট একেকটি অংশ সেলাই করতে থাকে। ৪০ জন শ্রমিক ও ১০ জন হেলপার বা সাহায্যকারীসহ একেকটি সারিতে একজন করে সুপারভাইজার থাকে। শ্রমিকরা যেন সময়মতো টার্গেট অনুযায়ী পোশাক উৎপাদন করে তা নিশ্চিত করাই সুপারভাইজারের কাজ। বড় কারখানাগুলোতে একেকটি রুমে বহুসংখ্যক সারি থাকে। তবে রুম ছোট হোক বা বড়, আলোকিত বা অন্ধকার যা-ই হোক, শ্রমিক ও সেলাই মেশিনগুলো এত গাদাগাদি করে থাকে যে ভেতরে ঢুকলে চোখে পড়ে কেবল একসারি নত মাথা এবং কানে আসে সেলাই মেশিনের একটানা শব্দ।

ক্রমবর্ধমান উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার চাপে এসব কারখানায় দুর্ঘটনা ও শ্রমিক মৃত্যুর ঘটনা এখন আর বিরল নয়। ২০১১ সালে মোদেলামা এক্সপোর্ট লিমিটেড নামের কারখানায় সেলাই মেশিন থেকে বৈদ্যুতিক শকে একজন শ্রমিক নিহত হয়। ২০১৪ সালের মার্চে গুরগাঁওয়ের ওরিয়েন্ট ক্র্যাফট কারখানায় নিজের ইলেকট্রনিক সেলাই মেশিনের ওপরে ঢলে পড়ে একজন শ্রমিক; প্রোডাকশন টার্গেট পূরণ করার কাজে ব্যস্ত শ্রমিকরা বেশ দেরিতে টের পায় তার মৃত্যুর ব্যাপারটি।

বস্তুত ওরিয়েন্ট ক্র্যাফটের মতো কারখানাগুলোর সাফল্যের পেছনে রয়েছে ক্রমবর্ধমান কাজের চাপ। ২০১৪ সালের মার্চ মাসের শেষের দিকে ক্রান্তিকারী নওজোয়ান সভা, ইনকিলাবি মজদুর কেন্দ্র, মজদুর পত্রিকা, পারসপেকটিভ, পিপলস ইউনিয়ন ফর ডেমক্রেটিক রাইটস, সংহতি ও ওয়ার্কার্স ইউনিটির সম্মিলিত সত্যানুসন্ধানী দল ওই কারখানায় চার বছর আগে থেকেই স্টপ ওয়াচের মাধ্যমে শ্রমিকদের কাজের ওপর নজরদারির ঘটনা জানতে পারে। ম্যাগনেটিক কার্ড রিডারের মাধ্যমে সেই নজরদারি আরো নিখুঁত করা হয়। দলটির দেওয়া প্রতিবেদন অনুসারে :

"শ্রমিকদের টেবিলে আসা প্রতি বান্ডেল কাপড়ের সাথে থাকে একটি ম্যাগনেটিক কার্ড। কাজ শুরুর আগে ও পরে প্রত্যেক শ্রমিককে এই কার্ডটি তার কাছে থাকা কার্ড রিডারে পাঞ্চ করতে হয়। এর মাধ্যমে প্রতিটি কাজের জন্য একজন শ্রমিক কত সেকেন্ড সময় ব্যয় করে এবং সারা দিনে কতগুলো পোশাক সেলাই করে তার হিসাব করা হয়।"

এই ধরনের যন্ত্র ব্যবহারের কারণে কাজের চাপ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। প্রতিবেদন থেকে দেখা যায়, প্রতি বান্ডেলে ১৫টি কাপড়ের টুকরা থাকে এবং প্রতি ঘণ্টায় এ রকম ৫ থেকে ১০টি বান্ডেল সেলাই করা সম্পন্ন করতে হয় শ্রমিকদের। একেকজন শ্রমিককে ঘণ্টায় ১৫০-২০০টি পর্যন্ত পোশাক সেলাই করার টার্গেট বেঁধে দেওয়া হয়।

সেলাই শেষে গার্মেন্টসের কোয়ালিটি বা মান পরীক্ষা শেষে ফিনিশিং সেকশনে পাঠানো হয়। এই সেকশনে পোশাকের বাড়তি সুতা কাটা, বোতাম ও লেস লাগানোর কাজ করা হয়। ফিনিশিংয়ের কাজ তুলনামূলক হালকা কাজ হিসেবে বিবেচিত হয়, যার জন্য

সাধারণত নারী শ্রমিকদের দিয়ে এই কাজ করানো হয়। এই নারী শ্রমিকদের কেউ কারখানায় আবার কেউ ঘরে বসে এই ধরনের কাজ সম্পন্ন করে। সকল ক্ষেত্রেই নারী শ্রমিকদের মজুরি তুলনামূলক কম। গবেষণার কাজে আমি একটি ফ্যাব্রিকেটর বা ছোট কারখানায় গিয়ে দেখেছি, পুরুষ শ্রমিকদের মজুরি যেখানে ৮ হাজার রুপি, সেখানে নারী শ্রমিকদের মাত্র ৫ হাজার রুপি মজুরি দেওয়া হয়। 'গৃহস্থালির কাজ করার জন্য' নারী শ্রমিকদের দুই ঘণ্টা আগে ছুটি দেওয়া হয়। গৃহস্থালির কাজ নারীদের—এ রকম পুরুষতান্ত্রিক বিশ্বাস ও ধ্যানধারণা মালিকদেরকে নারী শ্রমিকদের কম মজুরি প্রদানের সুযোগ করে দেয়।

এনসিআর অঞ্চলের পরিস্থিতি সারা ভারতের তুলনায় একটু ব্যতিক্রম এই অর্থে যে শুধুমাত্র এই অঞ্চলেই নারী শ্রমিকদের তুলনায় পুরুষ শ্রমিকদের সংখ্যা বেশি; যদিও হাল আমলে নারী শ্রমিকদের হার কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। সাধারণভাবে গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি নারী শ্রমিকপ্রধান। উদাহরণস্বরূপ ভারতের গার্মেন্টস শিল্পের কেন্দ্র বলে পরিচিত তামিলনাড়ুর তিরুপুরের কথা বলা যেতে পারে। বাংলাদেশের রানা প্লাজা দুর্ঘটনার সমসাময়িককালে একাধিক গবেষণায় তিরুপুর অঞ্চলে ১৮ বছরের কম বয়সী নারীদের বন্ডেড লেবার হিসেবে ব্যাপক সংখ্যায় নিয়োজিত থাকার ঘটনা প্রকাশিত হয়। সুমঙ্গলী স্কিমের আওতায় নারী শ্রমিকদের শুধুমাত্র এক বছর, দুই বছর বা পাঁচ বছর মেয়াদি চুক্তি শেষে একবারে মজুরি প্রদান করা হয়। যদি চুক্তির সময় শেষ হওয়ার আগেই তারা কাজ ছেড়ে যায়, তাহলে কোনো অর্থই তাদের প্রদান করা হয় না। তিরুপুরের এই স্কিম সম্পর্কে আন্তর্জাতিক শ্রম আইন পর্যবেক্ষণকারী ভেরিতে নামের একটি সংস্থার প্রতিবেদন অনুসারে : *"গার্মেন্টস শিল্পে অল্পবয়সী মেয়েদের নিয়োগ দেওয়া হয়, কারণ তাদের সহজেই হুমকি-ধমকি দেওয়া যায়, শোষণ করা যায় এবং কম মজুরি দিয়ে বেশি কাজ করানো যায়। সুমঙ্গলী স্কিমের আওতায় কাজ করা নারী শ্রমিকরা একই ধরনের কাজে নিয়োজিত পুরুষ শ্রমিকদের তুলনায় যথেষ্ট কম মজুরি পায়।"*

তৈরি পোশাক এরপর শেষবারের মতো পরীক্ষা করে, ইস্ত্রি করে, প্যাকেটে ভরে এবং লেবেল লাগিয়ে বক্সে ভরে ব্র্যান্ড কোম্পানির কাছে পাঠানো হয়। মজার ব্যাপার হলো, কোনো কারখানা হয়তো একই সাথে একাধিক ব্র্যান্ড কোম্পানির জন্য কাপড় তৈরি করে, যারা আবার পরস্পরের সাথে তীব্র প্রতিযোগিতায় লিপ্ত! কারখানার কাছে এক ব্র্যান্ড থেকে আরেক ব্র্যান্ডের পার্থক্য কেবলই লেবেল আর বাক্সের পার্থক্য।

শ্রমের মজুরি

বৈশ্বিক চেইন ও বহুসংখ্যক উৎপাদন অঞ্চল থাকার কারণে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে পরস্পরের সাথে প্রতিযোগিতায় নামানোর মাধ্যমে ব্র্যান্ড কোম্পানিগুলো পোশাকের উৎপাদন খরচ সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখতে সক্ষম হয়। শ্রমিকের কাছে এর অর্থ একটাই—নিম্ন মজুরি। বাংলাদেশের গার্মেন্টস শ্রমিকদের নিয়ে লেখা 'দ্য সং অব দ্য শার্ট' বইয়ে জেরেমি সিব্রুক দেখিয়েছেন, প্রতি ঘণ্টায় পোশাক শ্রমিকদের মজুরি চীনে ১.৬৬ ডলার, পাকিস্তানে ৫৬ সেন্ট, ভারতে ৫১ সেন্ট, ইন্দোনেশিয়ায় ৪৪ সেন্ট, ভিয়েতনামে ৩৬ সেন্ট এবং বাংলাদেশে মাত্র ৩১ সেন্ট (সিব্রুকের মতে, এই হিসাবটিও কিছুটা বাড়িয়ে বলা)। দিল্লি-গুরগাঁও এলাকার শ্রমিকদের নিয়ে কাজ করে এমন একটি সংগঠন হলো ওয়ার্কার্স ইউনিটি। তাদের হিসাব অনুযায়ী, ১৫০০ রুপি বা ২৪ মার্কিন ডলার মূল্যের একটি ব্র্যান্ডের শার্ট তৈরির জন্য শ্রম বাবদ খরচ মাত্র ২০ ভারতীয় রুপি বা ৩০ মার্কিন সেন্ট। বিভিন্ন দেশের মধ্যে এবং দেশের ভেতরের বিভিন্ন কারখানার পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা এত তীব্র যে কারখানাগুলো নিজেরাই চেষ্টা করে সবচেয়ে কম মূল্যে বিক্রি করার, তাদের লাভ আসে অর্ডারের সংখ্যার ওপর নির্ভর করে।

বিভিন্ন কারণে শ্রমিকের মজুরি এত কম রাখা সম্ভব হয়। প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায়, শ্রমিকরা মাইগ্র্যান্ট বা অভিবাসী, ফলে তাদের পক্ষে একত্রিত হয়ে ইউনিয়ন গঠন করা ও মজুরি বাড়ানোর দাবি তোলা কঠিন হয়ে যায়। গার্মেন্ট শিল্পের বেশির ভাগ শ্রমিকই নারী, যারা কম মজুরি পায়। বেশির ভাগ শ্রমিক অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োজিত, অনেকে আবার মৌসুমি শ্রমিক, যাদের সর্বোচ্চ চাহিদার সময় নিয়োজিত করা হয়। গৃহভিত্তিক শ্রমিকদের পিস রেটে মজুরি দেওয়া হয়। এই পরিস্থিতি শ্রমিকদের জন্য বাড়তি মজুরি বা উন্নত কর্মপরিবেশের দাবি আদায় করার জন্য একেবারেই সহায়ক নয়।

শ্রমিকের কর্মঘণ্টা ৯টা থেকে সাড়ে ৫টা পর্যন্ত, মাঝখানে আধা ঘণ্টার দুপুরের খাবারের বিরতি। কারখানার হেলপারের মজুরি ৩ হাজার রুপি (৪৮ মার্কিন ডলার) এবং সেলাই শ্রমিকের মজুরি ৬ হাজার রুপি (৯৬ মার্কিন ডলার)। যারা নমুনা বা স্যাম্পল তৈরি করে তাদের মজুরি ৮ হাজার রুপি (১২৮ মার্কিন ডলার) পর্যন্ত হতে পারে। অল্প কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া বেশির ভাগ কারখানাই নিয়ম অনুযায়ী প্রতি ঘণ্টা মজুরির দ্বিগুণ হারে ওভার টাইম প্রদান করে না। যেসব শ্রমিক ঘরে বসে কাজ করে, যেমন পোশাকে বাড়তি সুতা কাটে যে নারী শ্রমিকরা, তারা প্রতিটি পোশাকের জন্য ৩ রুপি (৫ মার্কিন সেন্ট) করে পায়। কারখানার সুপারভাইজারদের মজুরি প্রতি মাসে ২৫ হাজার রুপি (৪০০ মার্কিন ডলার), তা ছাড়া উৎপাদন বেশি হলে তাদের বাড়তি প্রণোদনা দেওয়া হয়। ফলে খুব স্বাভাবিকভাবেই দেখা যায়, সুপারভাইজাররা বাড়তি উৎপাদনের জন্য শ্রমিকদের ওপর বাড়তি চাপ প্রয়োগ করছে।

শ্রমিকদের মাসিক মজুরি দৈনিক ৮ ঘণ্টা কাজের ওপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হলেও এর সাথে প্রতিদিনের ৪ থেকে ৫ ঘণ্টা বাড়তি ওভার টাইম যোগ হওয়াটা নিয়মিত ঘটনায় পরিণত হয়েছে। ফলে একজন শ্রমিককে প্রতিদিনই রাত ৯টা বা ১০টা পর্যন্ত কাজ করতে হয়, নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারিতে সর্বোচ্চ চাহিদার সময় কাজের সময় আরো বাড়ে। এভাবে ওভার টাইমসহ একজন শ্রমিকের মাসিক আয় হয় ১০ হাজার রুপি (১৬০ মার্কিন ডলার)। শ্রমিকদের কথা হলো, এভাবে বাড়তি শ্রম না দিলে পরিবারের জন্য কিছুই করা সম্ভব হবে না। এমনকি এভাবে বাড়তি শ্রম দেওয়ার পরও শ্রমিকের পরিবারকে গ্রামেই থাকতে হয়, কারণ এই আয় দিয়ে পুরো পরিবার একত্রে দিল্লিতে থাকা কিছুতেই সম্ভব নয়। অনেক সময় আবার ওভার টাইম করাটা বাধ্যতামূলকও বটে। এক হিসাবে শ্রমিকরা মাসে ১০০ ঘণ্টারও বেশি ওভার টাইম করে থাকে; যদিও আইনত মাসে ৫৬ ঘণ্টার বেশি ওভার টাইম করা বৈধ নয়। ওভার টাইমের মজুরি আলাদা করে প্রদান করা হয় এবং এ ক্ষেত্রে হিসাবের গরমিল ঘটা বিরল নয়।

অনেক শ্রমিকের মজুরি পিস রেট ভিত্তিক, অর্থাৎ সময়ের পরিমাণের বদলে তৈরি করা পোশাকের সংখ্যার ভিত্তিতে মজুরি

নির্ধারিত হয়। এই শ্রমিকদের অনেকের আয় অনেক সময় ১৭ হাজার রুপি (২৭০ মার্কিন ডলার) পর্যন্ত হতে পারে। অবশ্য এ ক্ষেত্রেও কাজের গতি শ্লথ যেন না হয় এবং নির্দিষ্ট উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা যেন পূরণ হয় তার চাপ শ্রমিকদের ওপর থাকে। পিস রেটের হার গত ১৪ বছরেও তেমন একটা বাড়েনি। ২০০০ সালের শুরুর দিকে প্রতিটি শার্টের মজুরি ছিল ১৪ থেকে ১৫ রুপি, বর্তমানে সেই হার ২০ থেকে ২৫ রুপি, কোনো কোনো ক্ষেত্রে ৩০ থেকে ৩৫ রুপি। এমনকি মাসিক মজুরির ভিত্তিতে কাজ করা শ্রমিকদের মজুরি ১০০ থেকে ২০০ টাকা বৃদ্ধি মুদ্রাস্ফীতির হারের তুলনায় তেমন কিছুই না। এই ধরনের মজুরি বৃদ্ধি ঘটলে পরবর্তী বছরের জীবনযাত্রার মান আগের বছরের মতো রাখা খুবই কঠিন। শ্রমিকদের মতে, বাস্তবে তাদের প্রকৃত মজুরির কোনো বৃদ্ধি তো ঘটেইনি, উল্টো কমেছে।

দিল্লি-গুরগাঁও সীমান্তের দিল্লি অংশে কাপাশেরা নামক স্থানে গার্মেন্টস শ্রমিকদের এক বিশাল বসতি রয়েছে। উত্তর প্রদেশ থেকে আসা মোবারক এখানেই থাকেন। তাঁর কাছ থেকে শোনা যাক দিল্লি ও হরিয়ানা অঞ্চলে বিভিন্ন কারখানায় কাজ করে বিগত বছরগুলোতে কেমন আয় করেছেন তিনি। ১৫ বছর আগে মতিবাগের এক কারখানায় কাজ করার সময় তাঁর দৈনিক মজুরি ছিল ৮০ রুপি (১.৫০ মার্কিন ডলার)। ঘণ্টায় একটি শার্ট সেলাই করা যেত এবং দেড় ঘণ্টায় তৈরি হতো একটি প্যান্ট। তিনি কারখানার ভেতরেই থাকতেন। এভাবে প্রতি মাসে তিনি পরিবারের কাছে ১৫০০ থেকে ২০০০ রুপি (২৮ মার্কিন ডলার) পাঠাতে পারতেন। ২০০৩ সালে মতিবাগের কারখানাটি বন্ধ করে উদ্যোগ বিহার অঞ্চলে স্থানান্তরিত হলে তিনি কাপাশেরা অঞ্চলে চলে আসেন এবং উদ্যোগ বিহারেরই একটি কারখানায় কাজ নেন, যেখানে তিনি এখন পর্যন্ত আছেন।

যে কোম্পানির জন্য তিনি কাজ করেন সেই কোম্পানি সম্পর্কে মোবারকের খুব ভালো ধারণা নেই, কারণ তাঁর নিয়োগ একজন কন্ট্রাক্টরের মাধ্যমে। কাপাশেরা অঞ্চলে আসার পর শুরুর দিকে তাঁর দৈনিক মজুরি ছিল ২০০ রুপি, যা মতিবাগের তুলনায় বেশি হলেও এখানে জীবনযাত্রার ব্যয় তুলনামূলক বেশি। এখানে মতিবাগের মতো কারখানায় থাকা যায় না, ৬০০ রুপি রুম ভাড়া দিয়ে তাঁকে একটা জায়গায় থাকতে হয়। তা ছাড়া খাবারের মূল্যও তুলনামূলক বেশি। ফলে আগের তুলনায় বেশি আয় করলেও বাড়তি খরচের কারণে বাড়িতে আগের চেয়ে বেশি টাকা পাঠানো সম্ভব হলো না।

বর্তমানে মোবারকের মতো একজন শ্রমিক প্রতিটি শার্ট সেলাই করার জন্য ৮০ থেকে ৯০ রুপি এবং প্যান্ট সেলাই করার জন্য ১৫০ থেকে ২০০ রুপি মজুরি পান। দৈনিক ১১ ঘণ্টা কাজ করলে তার আয় হয় ৬০০ রুপি। বাড়িভাড়া বাবদ ২০০০ রুপি এবং খাবারের জন্য তার খরচ হয় ৩০০০ রুপি। কিন্তু এখন পর্যন্ত তার পক্ষে তার পরিবারকে দিল্লিতে নিয়ে আসা সম্ভব হয়নি, কারণ সে ক্ষেত্রে তাকে আরো বাড়তি ৬ থেকে ৭ হাজার রুপি আয় করতে হবে।

মানবেতর জীবন

গুরগাঁও অঞ্চলের বেশির ভাগ শ্রমিকই এসেছে উত্তর প্রদেশ, বিহার ও ঝাড়খণ্ড থেকে। এসব শ্রমিকের একটা বড় অংশই মুসলিম এবং জোলা সম্প্রদায়ভুক্ত, যারা দীর্ঘদিন ধরেই কাপড়ের কাজ করে আসছে। তাদের অনেকেই দক্ষ পোশাক শ্রমিক বা দর্জি, যারা ১০ বছরের বেশি সময় ধরে, এমনকি কেউ কেউ ২০ বছরেরও বেশি সময় ধরে কাজ করছে। কিন্তু জীবনের বড় একটা অংশ দিল্লিতে কাটানোর পরও দিল্লির নাগরিক হিসেবে কোনো পরিচয়পত্র তাদের জোটে না। অল্প কিছু কারখানা বাদ দিলে বেশির ভাগ কারখানাই শ্রমিকদের তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে নিয়োগ দিয়ে থাকে। প্রায় ৮০ ভাগ শ্রমিকই অস্থায়ী চুক্তিভিত্তিক (ওয়ার্কার্স ইউনিটির হিসাব অনুযায়ী এই হার শতকরা ৯০ ভাগ), যাদের ইচ্ছামতো ছাঁটাই করা যায়।

খুব অল্পসংখ্যক শ্রমিক স্থায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করে এবং সবেতন ছুটি ও মাতৃত্বকালীন ছুটির অধিকার ভোগ করতে পারে। অবশ্য শ্রমিকদের মতে, স্থায়ী শ্রমিক বলে কিছু নেই, এমনকি ১০ বছর কাজ করার পরও শ্রমিকদের ইচ্ছামতো ছাঁটাই করা যায়। প্রায়ই ৫ বছর শেষ হওয়ার আগে আগে শ্রমকিদের ছাঁটাই করা দেওয়া হয়, যেন গ্র্যাচুইটি প্রদান করতে না হয়। কয়েক সপ্তাহ পরে শ্রমিকদের আবার কাজে যোগদানের সুযোগ প্রদান করা হয়।

দৈনিক ১২ থেকে ১৪ ঘণ্টা কাজ করার পরও শ্রমিকদের পক্ষে খুব বেশি হলে উদ্যোগ বিহার থেকে ৩০ মিনিটের হাঁটা পথের দূরত্বে কাপাশেরা বা দুনদাহেরা অঞ্চলের ঘিঞ্জি বসতিতে ছোট্ট একটি রুম ভাড়া করা সম্ভব হয়। সরু গলির মধ্যে খোলা উপচে পরা নালার পাশের ভবনগুলোর প্রতিটির একেক তলায় ১৫টিরও বেশি ছোট ছোট কক্ষ থাকে। এইসব কক্ষে বাতাস চলাচলের কোনো ব্যবস্থা থাকে না, পৃথক রান্নাঘর থাকে না, প্রতি তলার জন্য থাকে মাত্র তিনটি টয়লেট। বিদ্যুতের বিল ছাড়াই প্রতিটি কক্ষের ভাড়া পড়ে ১৬৫০ থেকে ২১০০ রুপি। একজন শ্রমিকের পক্ষে পুরো কক্ষ ভাড়া নেওয়া সম্ভব হয় না। সাধারণত ২ থেকে ৩ জন মিলে একেকটি কক্ষ ভাড়া নিয়ে থাকে, অনেক সময় তৃতীয়জনের জন্য মালিককে বাড়তি ভাড়া প্রদান করতে হয়। যেসব ক্ষেত্রে শ্রমিক তার পরিবারের অপরাপর শ্রমজীবী সদস্যসহ একত্রে থাকে, তখন বাড়ি মালিকরা শিশুদের সর্বোচ্চ সংখ্যা নির্ধারণ করে দেন এবং সন্তানের সংখ্যা এর চেয়ে বেশি হলে বাড়তি অর্থ আদায় করেন। কোনো কোনো বাড়ি মালিক ভাড়াটিয়া শ্রমিকদেরকে তার নিজস্ব দোকান থেকে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বাড়তি মূল্যে কিনতে পর্যন্ত বাধ্য করেন। এই শ্রমিকদের দিল্লি রেশন কার্ড না থাকায় তাদেরকে খোলাবাজার থেকে রেশন ও গ্যাস বেশি অর্থ দিয়ে ক্রয় করতে হয়।

কাপাশেরা ও দুনদাহেরার এইসব বিশাল শ্রমিক বসতি গুরগাঁওয়ে অবস্থিত দেশের অভিজাত শ্রেণির বিলাসবহুল খামারবাড়ি থেকে চোখেই পড়ে না। এই চোখে না পড়ার ব্যাপারটি যে দুনিয়ার জন্য শ্রমিক উৎপাদন করে, তার সাথে শ্রমিকের জীবনের বিচ্ছিন্নতাকেই যেন নির্দেশ করে। এই শ্রমিকদের জীবনের নির্মম বাস্তবতা হলো, যদিও শ্রমিকরা চায় না তাদের সন্তানরাও এই শিল্পে কাজ করুক, শিক্ষার পর্যাপ্ত সুযোগের অভাবে শ্রমিক সন্তানরাও তাদের মা-বাবার জীবনের ফাঁদেই আটকা পড়বে। আরো একটা প্রজন্ম শার্ট সেলাই করতে করতে নিজেদের জীবন ক্ষয় করবে, যে শার্ট পরার সামর্থ্য তাদের কোনো দিনই হবে না। আরেকটা প্রজন্ম নিরন্তর শ্রম দেবে মেশিনে পূর্ণ ঘরের ভেতরে।